আদর্শ হিন্দু-হোটেল

(উপন্যাস)

বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

B2296

S C L Kolkata

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ

—চার টাকা—

২২৭৬

STATE CENTRAL LIBRARY
W.B. BENGAL
CALCUTTA
৪.১১.৫৯

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও লোক-সেবক প্রেস, ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান নটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে

এই লেখকের বই-

পথের পাঁচালী
অপরাজিত
কিন্নরদল
জন্ম ও মৃত্যু
আরণ্যক

যাত্রাবদল
বিচিত্র জগৎ
দৃষ্টিপ্রদীপ
মেঘমল্লার
স্মৃতির রেখা
বিপিনের সংসার
অনুবর্তন
নবাগত
তৃণাঙ্কুর
আচার্য কৃপালনী কলোনী
ইছামতী

দেবযান
বনে পাহাড়ে
ঊর্মিমুখর
অভিযাত্রিক
বেণীগির ফুলবাড়ী
দুই বাড়ী
বিধু মাষ্টার
কেদার রাজা
অসাধারণ
ক্ষণভঙ্গুর
উৎকর্ণ
উপলখণ্ড
কুশল পাহাড়ী
চাঁদের পাহাড়
মরণের ডঙ্কা বাজে
আম আঁটির ভেঁপু
ছোটদের পথের পাঁচালী

...টের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন ...-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌সিম্‌ খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তাপোশে কাঠের বাক্সের ওপর কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁর ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের দিয়া রাস্তায় পড়িতে সুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে ...দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল তরকারী —হিন্দু-হোটেল বাবু—

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের ...র সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে —কোন্‌ ক্লাসে খাবেন? ফাষ্ট ক্লাস না সেকেন্‌ ক্লাস—ফাষ্ট ক্লাসে আনা, সেকেন্‌ ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট টুকরা সাদা কাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে

হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে-বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের লই। তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্যে। খাইবার দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাষ্ট ক্লাস, অন্য সেকেন্ ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উ... তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে। রসুয়ে-বামুনেরা চুরি করিতে না পা

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটে চারজন লোক খদ্দের। দ ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাক্ গে। তুই আর একটু এগিয়ে শা শান্তিপুর আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকে আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর না চড়ায়। এক ডেক্চিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পয়সা দেও ব দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাষ্টো কেলাসে খাবে। আমায় পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্তো? খদ্দের?

—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এমনি ন ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু দিনের জন্যে আসবে—তার কাছ থেকে পয়সা কিসের? দইয়ের পয়সা নি যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে, তাই হয়। তাহার উপর বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে ষ্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের বেশী ক'রে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবে না রেখো—আমার খরচ না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হাটে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমায় পই-পই ক'রে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনা বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাষ্টো কেলাস-টেলাস তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয় ফাষ্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট্ কমিয়েছে —শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল্ না। কারও কানে গেলে এখুনি—

এমন সময় ছ'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে খাবেন বাবুরা? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে আর ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি ক্ষেপামা আর সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয়—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হ'লে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল—হারামখো মিন্‌সে আবার শুনতে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত কর লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার

হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই—আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেল—

—আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা-দশটা খদ্দের ফি-দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনো মজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল, সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খদ্দের বাবুরা গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেনো রাঁধো ব'লে—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো—

—ডাল কতটা আছে দেখলি?

—লবডঙ্কা। আর মেরে-কেটে তিন জনের মত হবে—

—ক'জনের মত ডাল দিইছিলি?

—দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের জন্যে দিইছি—সেকেন্ কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল—

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স প'য়তাল্লিশ-ছ'চল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো দেখিলে মনে হয় লোকটা নিপাট ভালমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হ'ল কি ক'রে?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হ'লে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইসি ঠাকুর। আমি পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাত শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা কড়িও দিয়েছে

বোধ হয় বকশিশ্—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্ম-দিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে-মুখে তক্কো করো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জি কিনে দেয় নি?

—ইস্—ভারি গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে—

—কেন বাবু, আমার কি দোষ হ'ল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নচ্ছার, বদমাইস, গাঁজাখোর কোথাকার—দশ জনের দশ ছটাক আড়াই পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের ক'রে?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

২

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেক্চিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্ম ঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে —সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায় না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত খালি-পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেক্‌চিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে—অত ভাত খাবে কে? ও তো তিনজনের খোরাক—আমার থালায় আর দুটো বেশী ক'রে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইস্‌ মাগী—পেট ভরে' যে কেউ খায়—তাও তার সহ্য হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুন এক থালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে? বাব্বাঃ, যেমন কর্তা, তেমনি গিন্নি—(পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নি বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমায়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারের ঠাকুরবাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জনে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তার পর কর্তার কাছে চাল-

চক্লোর হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শুইবার অবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড বসিয়া ভাবিবার সময় কই?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাব-ভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করে।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্তা সামনেই বসিয়াছিলেন। বলিলেন—কি চাই?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে?

—তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী।

এইভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায়?

—গাংনাপুর ইষ্টিশানে নেমে যেতে হয় এড়োশোলা গ্রামে।

—রাঁধতে জানো?

—বাবু, একদিন রাঁধিয়ে দেখুন। মাংস মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিনদিন এমনি রাঁধতে হবে—তারপর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজি থাকো আজই কাজে লেগে যাও!

সেই হইতে আজ পর্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দের বাবুরা সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভালো কথা তো দূরের

মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভালো কথা তো দূরের কথা, পদ্ম ঝি তাহাকে আঁশবঁটি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায়? যাক্, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোদিন—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে।

সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—

হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

কর্তার মত তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাঁধুনী-বামুন ও ঝি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এ হোটেলের মত ঝিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খদ্দেরদের ভাল জিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে বুঝিয়া দেখিল, লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট্ দিতেও আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেঁসারি ডাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তা মাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্য কিনিবে না।

এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই—যাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়—কিন্তু তাহার মনে হয়, বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে সে-হোটেলে লোক বেশী আসিবে—অনেকেই খাওয়ার পরে একটু গড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটেলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খদ্দেরের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তাপোশের ওপর সতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকিবে, বালিস থাকিবে, তামাক খাইবার

বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেও অনায়াসে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটের কোনো হোটেলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেও না। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইষ্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল', বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খদ্দের আসে?

খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোক ঝুঁকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটেলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে দেখিতে দেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটেলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘর খুলিয়া বসিবে—যদি তাহাতে খদ্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারই সুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাথায় আছে, শুধু খদ্দেরদের বিশ্রাম-ঘর কেন। মোকদ্দমা-মামলা যাহারা করিতে আসে, তাহারা সারাদিনের খাটুনির পরে হয়তো খাইয়া-দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়—সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক্।

চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহার মনে আসে। কিন্তু কখনও কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বয়স তো হইয়া গেল ছ'চল্লিশের উপর—সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই, সাত টাকা মাহিনার চাকুরী আজও ঘুচিল না—ছা-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা, এই চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া? ভাবিতে বেশ লাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত্র সে নয়। ছ'চল্লিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচিবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, একটা হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া

সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া মরিয়া গেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল।

আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিবে না। পদ্ম ঝি এতক্ষণ উনুনে আঁচ দিয়াছে, দেরী করিয়া গেলে তাহার মুখনাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়—অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিন্‌কালে।

ফিরিবার পথে ছোট বাজারে রাধাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়।

—বাবা রাধাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো। পদ্ম ঝির ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ঐ কর্তাবাবুর হোটেলের পাশে পদ্ম ঝিকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পদ্ম ঝি উনুনে আঁচ দিয়া কোথায় গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

—শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিষ্টি করবেন, তাঁরা আমায় আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা করবে। ওঁরা মুর্শিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসে নি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্কত্তি একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনও ইহারা তাহার রান্না ভাল বলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে!

রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এড়োশোলা গ্রামে একজন সেকালের

চারিদি ব্রাহ্মণ-বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় শুধু সাধারণ ধরনের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ ধরনের সুনামও ছিল। বাহিরেও অনেক জায়গায় লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল—খুড়ীমা, আপনার তো বয়স হয়েছে, কবে চলে যাবেন—আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন—আচ্ছা তোকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি ক'রে নিরিমিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একটি জিনিস রাঁধিবার গুণেই, হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস—নিরিমিষ চচ্চড়ি—ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এ-কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—মাংস, মাছ সবই রাঁধে ভাল—কিন্তু তার হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চক্কত্তির হোটেলে একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে—সে আর কোথাও যাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধিবার ভার তাহারই উপর পড়িল। খদ্দেররা মাংস খাইয়া তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই—খদ্দেরের মুখের প্রশংসা ছাড়া। পদ্ম ঝি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাও বলিল না। বেচু চক্কত্তিও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্য তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, কর্তাবাবু নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পদ্ম ঝি চাটিয়া-পুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মুস্কিল ঘটে। তাহার জন্য কিছুই থাকে না, এক-একদিন ভাত পর্যন্ত কম পড়িয়া যায়—মাছ, তো দূরের কথা। বয়স ছ'চল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে, খাইতে ভালও বাসে—কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট ভরে না।

রাত সাড়ে বারোটা। কর্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেলে সে আর মতি চাকর ছাড়া আর কেহ রাত্রে থাকে না। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রাত্ত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল—চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্চে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর?

—এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি! সারাদিন খেটে আবার ও-সব সখ থাকে? আমি যাবো না—তুই যাস্ তো যা। এসে ভাঁড়ার ঘরের জানলায় টোকা মারিস্। দোর খুলে দেবো।

মতি চাকর ছোক্‌রা মানুষ। তাহার সখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয্যেকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের সংগে তাহাদের রেষারেষি করিয়া কারবার চলে। তিনি এত রাত্রে এখানে কি মনে করিয়া? কখনো আসেন না। হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুয্যেও একটা হোটেলের কর্তা, সুতরাং হাজারির কাছে সেও তার মনিবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল, আর কে আছে ঘরে?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণ মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল—বিনীতভাবে বলিল—কেউ নেই বাবু আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—চল ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সংগে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বেচু চক্কত্তির গদিতে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

—কাপড়-চোপড় দেয়?

—আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুয্যে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—শোন, আমার হোটেলে তুমি কাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা মাইনে আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা কাপড় পাবে। ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক—সব। যাবে?

হাজারি দস্তুরমত অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না। তারপর বলিল—বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

—ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজি। তবে বেচু চক্কত্তির সঙ্গে আমি অস্‌সরস করতে চাই নে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম ঝি কোথাও আড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন আমি কোন কথা বলতে পারবো না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যা নয়, তবে খায় খুব সঙ্গোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না। সংসারে কেহ এ পর্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল বলিয়া খাবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরস্কার দিতে চায় নাই—খদ্দেরের মুখের ফাঁকা কথায় পেট ভরে না তো!

যদুবাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার